শিক্ষার মিলন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের আলোচ্য 'শিক্ষার মিলন' একটি 'শিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে গৃহীত হয়েছে। এই প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার সত্যকার দিকটি তুলে ধরতে চেয়েছেন। যেখানে তিনি পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের ভেদকে বড় করে দেখতে রাজি হননি। তিনি মনে করেছেন, পশ্চিমের বিদ্যাও গ্রহণীয়। কারণ, বিদ্যা জিনিসটি সর্বদাই সত্য। কোনো বিরুদ্ধ জাতির বিদ্যা বলে জিনিসটার বিরুদ্ধতা করা নির্বুদ্ধিতারই পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ দেখাতে চান পশ্চিমীবিদ্যার বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস আর রাজনৈতিক সচেতনতাকে। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন প্রাচ্যে এই শিক্ষার অভাবকে। তাই, এখানে মানুষ হাত-পা গুটিয়ে ঈশ্বরের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। এর প্রমাণ স্বরূপ একটি ঘটনা উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ জানান, একবার যখন তিনি গ্রামে গিয়ে আগুন লাগায় তা নেভাতে না পারার কারণ জানতে চান, তখন গ্রামবাসী উত্তর দিয়েছিল 'কপাল'। কিন্তু, তিনি যখন জানান, কপাল নয়, কুয়োর অভাবেই এই দুর্ঘটনা, একটা কুয়ো করা হয় না কেন তখন তারা উত্তর দেয় ''আজ্ঞে, কর্তার ইচ্ছে হলেই হয়'' — এই কর্তাভজা শিক্ষা, মানুষের কর্ম উদ্যোগ না থাকা, ভাগ্যান্বেষী হয়ে থাকা — প্রাচ্যের এই সকল দুর্বলতাকে তিনি ধিক্কার দিয়ে পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী বিজ্ঞান শিক্ষাকে গ্রহণের কথা বলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ কখনোই একমুখীন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলেন না। তিনি যেমন পাশ্চাত্যের মহৎ বিদ্যাকে অনুসরণ করে প্রাচ্যের দুর্বল বিদ্যাকে পরিহার করতে বলেছেন তেমনি আবার প্রাচ্যের বিদ্যার ভালো দিক মহৎ দিককে দেখিয়ে পাশ্চাত্যের যান্ত্রিক বাস্তুবাদী শিক্ষাকে বর্জন করতে বলেছেন। বলেছেন, পাশ্চাত্যেরও উচিত প্রাচ্যের শিক্ষার এই দিককে গ্রহণ করা। অর্থাৎ, প্রাচ্যেরও রয়েছে কিন্তু ভালো বিদ্যা। আমরা এবারে দেখবো প্রাবন্ধিক সে প্রসঙ্গে কী বলেছেন।

প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন, পশ্চিমী শিক্ষার বৈজ্ঞানিক চেতনা এবং স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও তাদের সবটাই ভালো নয়। তাদের ভোবসর্বস্ব ঐশ্বর্যমণ্ডিত শক্তির সাধনাকে রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করেননি। তিনি বলেন, ঐশ্বর্যের দানবপুরীতে সৃষ্টির সুর বাজে না। কারণ, তাদের নেই সংযমের শিক্ষা বা বৈরাগ্যের শিক্ষা। যা আছে প্রাচ্যের — ভারতের। তিনি বলেছেন, পশ্চিমি সমাজে মানুষের সম্পর্কটা যেন স্ক্রু দিয়ে আঁটা, আঠা দিয়ে জোড়া। এই বন্ধনেও কোনো আত্মীয়তা নেই। যা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়।

প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, দেশ সমাজ ও মানুষের হিতসাধনের আসল উপায়টি ভারতবর্ষীয় ঋষিরাই বলে গেছেন — সেটা হলো, উপনিষদের মিলনমন্ত্র। সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ''যারা এক আত্মাকে আপনাদের সকলের মধ্যে দেখতে চেয়েছিল তারাই মহাজাতি রূপে প্রকাশ পেয়েছে।''

আলোচ্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এক উন্নত সংঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষার সাধনার কথা বলেছেন। যে শিক্ষা স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে মানুষকে মুক্তি দেবে, ভেদ বুদ্ধি দূর করার মন্ত্র দেবে। পশ্চিমের মানুষের প্রধান অভাব শান্তির, ঐক্যের সাধনাতেই রয়েছে এই শান্তির সন্ধান। আর এই শান্তির সন্ধান দিতে পারে প্রাচ্য তথা ভারতবর্ষ। রবীন্দ্রনাথ চান এদেশের শিক্ষাকে পূর্ব-পশ্চিমের মিলন নিকেতন করে তুলতে। যেখানে থাকবে পশ্চিমের সত্য সাধনা আর ভারতের শান্তি সাধনা। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান সাধনা আর প্রাচ্যের অধ্যাত্ম সাধনার মেলবন্ধনেই বিকশিত হবে প্রকৃত শিক্ষা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই শিক্ষার মিলন-ই হলো প্রকৃত শিক্ষার অঙ্গন। এ বার্তাই রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধের মূল বার্তা।

পূর্ব ও পশ্চিম প্রবন্ধের মূল কথা —

'সমাজ' প্রবন্ধের অন্তর্গত 'পূর্ব ও পশ্চিম' শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা সমাজমনস্ক রবীন্দ্রনাথের পরিচয় পাই। ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের গভীর দর্শন আলোচ্য প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে।

ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক সূত্র অনুসন্ধান করলে দেখা যায় আর্য-অনার্য, হিন্দু-মুসলিম, ইংরেজ-ফরাসী সকলেরই সাংস্কৃতিক চিহ্ন রয়েছে সেই ইতিহাসে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, প্রথমে ভারতবর্ষ ছিল অনার্যদের, তারপর আর্যরা এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তৈরি হয়েছে মিশ্র হিন্দুসমাজ। দীর্ঘদিন ভারতবর্ষে এই মিশ্র হিন্দুসমাজের আধিপত্য ছিল। কিন্তু, তারপর কালক্রমে তুর্কী আক্রমণ এবং আরো পরে বাবরের হাত ধরে মুসলমানদের প্রবেশ ঘটলো ভারতে। হিন্দুদের সঙ্গে মিশে তারাও ভারতবাসী রূপেই পরিচিত হলো।

আলোচ্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বোঝাতে চেয়েছেন শুধু ভারতবর্ষ নয়, পৃথিবীতে কখনও কোনো জাতি এককভাবে মাথা তুলে গর্বিত ভূমিকা গ্রহণ করলে অচিরেই তা বিনষ্ট হবে। ভারতবর্ষের ইতিহাস যে সার্থকতার মূর্তি পরিগ্রহ করবে সেই মূর্তি সমগ্রের মূর্তি — তা হিন্দু-মুসলমান বা ইংরেজদের স্ব-জাতির অভিমান নয়। এর পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ 'আমিত্বে'র অহংকার থেকেও মুক্ত হবার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমরা' বলে কোনো জাতি, কোনো ধর্ম যদি অন্যের সংস্রব বাঁচিয়ে নিজেদেরকে জাহির করে ভারতবর্ষ হয় তাকে সকলের সঙ্গে মিশিয়ে নেবে, নয়তো পরিত্যাগ করবে।

আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক 'পশ্চিম' বলতে বোঝাতে চেয়েছেন পশ্চিমের প্রতিনিধি ইংরেজকে। একটি কবিতায় তিনি বলেছিলেন ''পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার / সেথা হতে সবে আনে উপহার।'' ঠিক একইভাবে এই প্রবন্ধেও তিনি বলেছেন, ''ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের মিলন সার্থক করিতে হইবে।'' আমরা অর্থাৎ বাঙালি, মারাঠী, পাঞ্জাবী, হিন্দু-মুসলমান সকলেই। এই অখণ্ড হতে পারবে ভবিষ্যৎ ভারতের কাণ্ডারী — এমনটাই রবীন্দ্রনাথ মনে করেন।

পশ্চিমের সঙ্গে, ইংরেজদের সঙ্গে এই সার্থক মিলনের পক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে মতামত প্রকাশ করেছেন, তার সমর্থন খুঁজেছেন পূর্বোক্ত মণীষীদের কথায় ও কাজে। রামমোহন রায়, বিবেকানন্দ, রানাডে, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ মহামানবেরা এই মিলন সাধনের কার্যেই হাত লাগিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ সম্পর্কে প্রাবন্ধিক বলেছেন, ''তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিম ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।'' একইভাবে সকল ভারতবাসীকে মেলবন্ধন ঘটাতে হবে, তবেই মনুষ্যত্বের যথার্থ ধর্ম রক্ষা হবে। রামমোহন বা বিবেকানন্দের মতো মহর্ষিরা নিজের স্ব-ভুমির উপরে দাঁড়িয়ে নিজের বিচারশক্তি দিয়ে যেভাবে পশ্চিমকে গ্রহণ করেছিল সেইভাবে মুক্তমনে পশ্চিমের সকল ভালোকে গ্রহণ করতে হবে আর মন্দকে ত্যাগ করতে হবে।

প্রবন্ধের শেষে এসে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ আমাদের এক মহৎ সত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। তিনি বলেন, বণিক-সৈনিকদের ইংরাজকে নয়, যে ইংরেজ জ্ঞানের প্রতীক, সভ্যতার প্রতীক, শিক্ষার প্রতীক তাকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই দেশের সঙ্গে দেশের, জাতির সঙ্গে জাতির মিলন সংঘটিত হবে, তবেই ইতিহাসের অঙ্গীভূত হওয়া সম্ভবপর হবে। 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ এই যথার্থ মিলনের প্রসঙ্গকেই প্রাধান্য দিয়েছেন, এই প্রসঙ্গই এই প্রবন্ধের প্রধান কথা।